# বিজ্ঞানাচার্য
# সত্যেন্দ্রনাথ বসু

অচিন্ত্যকুমার মাইতি

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

# সূচিপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ | : | দেশ ও পরিবেশ | ১১ |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | : | জন্মস্থান ও বংশ পরিচয় | ১৯ |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | : | ছাত্রজীবন | ২৩ |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ | : | কর্মজীবন—কর্মের স্বীকৃতি | ৩৭ |
| পঞ্চম পরিচ্ছেদ | : | সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্যচর্চা | ৭৫ |
| ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | : | বিখ্যাত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে | ৯২ |
| সপ্তম পরিচ্ছেদ | : | ব্যক্তিগত জীবন | ১২৪ |
| অষ্টম পরিচ্ছেদ | : | উপসংহার | ১৪৪ |
| | | জীবনপঞ্জি | ১৫২ |

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

# দেশ ও পরিবেশ

বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা হত। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, লীলাবতী, চরক, সুশ্রুত এবং প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ বৌদ্ধ নাগার্জুনের নাম ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অমর হয়ে আছে। কিন্তু এরপর প্রায় হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে। এই রুদ্ধ দ্বার আবার উন্মোচিত হল ঊনবিংশ শতাব্দীর শুভলগ্নে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে ভারতে আবার আরম্ভ হল বিজ্ঞানচর্চা। বিজ্ঞান সাধনা নতুন করে গতি পায় ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে। সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল— এশিয়া মহাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি নিয়ে

গবেষণা করা এবং প্রকাশনা করা। প্রথমে ইউরোপীয়রাই এই সোসাইটির সদস্য হতে পারতেন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভারতীয়রা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচিত হন। এঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন ও শিবচন্দ্র সেন প্রমুখ ছিলেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। মিশনারিরা ইংরেজি শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মিশনারি কেরি সাহেব শ্রীরামপুর চলে এলেন। সেখানে তিনি একটি কলেজ খুললেন এবং জন ম্যাক নামে একজন শিক্ষককে রসায়ন পড়াবার জন্য নিযুক্ত করলেন। জন ম্যাক এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসেছেন। ম্যাক বাংলা ভাষায় একটি রসায়নের বইও লিখেছিলেন। ভারতীয় ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের বই হিসেবে এটাই প্রথম। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকেরা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বড়োলাট আমহার্স্টের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষার দাবি করেন। বিজ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যে তিনি বিশেষ করে গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও রসায়নের উল্লেখ করেছিলেন। হিন্দু শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে জেমস প্রিন্সেপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেজর হার্বট ও জেমস প্রিন্সেপ যুগ্মভাবে 'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, পরে

পত্রিকাটির নামকরণ হয় 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল।' ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্সেপ এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক হন। পত্রিকাটিতে প্রিন্সেপের বিভিন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়।

১৮৩৫ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় মেডিক্যাল কলেজ। শুরু হল আধুনিক ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শিক্ষা। ১৮৩৮ সালে মেডিক্যাল কলেজ থেকে চারজন বাঙালি ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এঁরা হলেন—উমাচরণ শেঠ, নবীনচন্দ্র মিত্র, রাজকৃষ্ট দে ও দ্বারকানাথ গুপ্ত। ১৮৪৪ সালে মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে উচ্চ শিক্ষার্থে প্রথম বিলেত যান ভোলানাথ বসু, সূর্যকান্ত চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বসু ও গোপালচন্দ্র শীল। ১৮৩৫ সালের পর যে-সব বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করল তাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ, জিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অন্যতম। ১৮৮০ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটিকে কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত করে হাওড়ার শিবপুরে আনা হল। সে-সময়ে ভারতবর্ষের বুকে যতটুকু বিজ্ঞানচর্চা হয়েছে, তা কলকাতা শহরেই হয়েছে। সে জন্য বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় বিজ্ঞানের পীঠস্থান হল কলকাতা।

১৮৫৭ সালের ৩১ জানুয়ারি ভারতের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আইন পাস করেন। আইনটি ১৮৫৭ সালের অ্যাকট নং-২

হিসেবে চিহ্নিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। প্রতিষ্ঠা দিবস ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি। উপাচার্য হলেন স্যার জেমস্ উইলিয়ম কলভিল। যে ৩৯ জন সদস্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট গঠিত হয়, তাতে ৩৩ জনই শাসন, শিক্ষা, সামরিক, পুলিশ, বিচার বিভাগ ও মিশনারি সংস্থা ও স্কুল কলেজের সঙ্গে জড়িত ইউরোপীয় সদস্য। বাকি ৬ জন মাত্র ভারতীয়। তাঁরা হলেন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মৌলবি মুহম্মদ ওয়াজি। ১৮৫৭ সালের দুটি ঘটনা বঙ্গবাসীর মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করল। একটি ঘটনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং অপরটি সিপাহী বিদ্রোহ। একটি শিক্ষাজগতে নতুন জোয়ার আনল, অপরটি রাষ্ট্রব্যবস্থার নতুন ধারার সূচনা করল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পরে কলকাতায় উচ্চ শিক্ষার জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—সব প্রতিষ্ঠানেই বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ মিলল। দেশে প্রতিষ্ঠিত হল ১৭০টি বিজ্ঞান শিক্ষার কলেজ, চারটি মেডিক্যাল কলেজ, পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি বিদ্যালয়। দেশে যেমন বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তার লাভ করল, তার পাশাপাশি শুরু হলে গেল এক অসম ব্যবস্থা। ভারতীয়দের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হল। শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি ব্রিটিশ সরকারের অপসারণ দাবি করল। ব্রিটিশ শাসকরা আস্তে আস্তে এদেশের পুঁজি বিদেশে লগ্নি

করতে শুরু করল। ভারতে আর্থিক অবস্থার শোচনীয় অবনতি ঘটল। ফলে দিকে দিকে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল—এল নীল বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ। উনিশ শতকের শেষভাগে ভারতীয়দের দুর্গতির সৃষ্টি হল। তা ছাড়া ভারতীয় শিল্পপতিদেরও শিল্প প্রসারে চরম আঘাত হানল ব্রিটিশরা। উচ্চপদে ভারতীয়দের চাকরি দিতে ব্রিটিশ শাসকরা অনীহা প্রকাশ করল। শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে ইংরেজদের আধিপত্য রইল। ফলে সব দিক দিয়ে শিক্ষিত ভারতীয়রা বেকার হয়ে পড়ল। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক আলোড়ন পড়ে গেল এবং তাঁরা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এরই ফলশ্রুতি ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম। ওই বছরেই ড. মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স'। উদ্দেশ্য হল, স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের দ্বারা ভারতীয়রা যাতে তাদের জীবনের ছন্দে নব নব স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পায়।—এ যেন ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে এক চরম প্রতিবাদ, যেন ভারতীয়দের এক নতুন অঙ্গীকার। একশো বছর পর পরাধীন ভারতবাসী মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা লাভ করল। 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয়দের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার অধিকারের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। তখন ভারতে যা কিছু গবেষণা হত তার মূলে ছিল ভারতীয়রা। কিন্তু তাঁরা তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি পেত না, স্বীকৃতি